



## Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 565 - 574

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

# বিশ শতকের আট ও নয়ের দশকের বাংলা উপন্যাস : একটি বীক্ষণ

চিরঞ্জিত মান্ডি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

Email ID: [chiranjitmandi123@gmail.com](mailto:chiranjitmandi123@gmail.com)



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

### Keyword

Literature,  
Bengali  
novels,  
Politics.

### Abstract

Literature is the banyan tree of time, encompassing everything like its sprawling branches. It is inevitably bound by the constraints of time. Literature serves as both a mirror of society and a document of its era. Time must be the central focus of its progression. A creator incorporates the twists and turns of time into their work in their own unique style. Literature cannot advance by denying or transcending time; it must conform to its mold. Every branch of literature flourishes with leaves and blossoms. In this essay, I have attempted to portray the signs of time and place that were constructed in Bengali novels of the 1980s and 1990s.

### Discussion

সাহিত্য সমাজ বিচ্ছিন্ন অ-মূল বৃক্ষ নয়, দেশ-কালের গণ্ডি আঁকা ভূমিতে শেখর সঞ্চালিত করেই তা পত্রপল্লবে বিকশিত হয়ে ওঠে। শিল্প সাহিত্যের বিচারের ক্ষেত্রে তাই লেখার তথা লেখকের কলাটিকে স্মরণ রাখতে হয়। কেননা একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে স্ব-কালের আশা নিরাশার কার্য-কারণ সম্পর্কজনিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নির্মাণ করেন শিল্পের অবয়ব। এ প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—

“যিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তিনি দেশ ও কালকে উপেক্ষা করিয়া যত বড়ো কল্পনাকেই আশ্রয় করুন না কেন, তাহা জীবন ও প্রাণময় হইবে না। সত্যকে আমরা দেশ-কালের প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যেই উপলব্ধি করি, সেই অনুভূতিই প্রতিভার শক্তি বলে শ্বাশত ও সার্বজনীন হইয়া ওঠে।”<sup>১</sup>

অর্থাৎ দেশ-কালকে সরিয়ে কোন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। সাহিত্যকে তাই সমাজের দর্পণ রূপে চিহ্নিত করা হয়। গুঢ় ধর্ম চর্চা থেকে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন সকল সাহিত্যেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দেশ-কালের ছায়াপাত ঘটেছে। আধুনিক যুগের সাহিত্য বিশেষত কথাসাহিত্যিকদের সব থেকে বড়ো উপাদান সময়। উপন্যাসের সময় এই প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাটি প্রণিধানযোগ্য তিনি বলেছেন -

“ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তার সময়জ্ঞান, সমাজজ্ঞান, ইতিহাসজ্ঞান, এবং ব্যক্তিমানসের জ্ঞান এই সমস্তের সারাংশ।”<sup>২</sup>

ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর সময় ও ইতিহাস নিজ অভিজ্ঞতা এবং জীবনের মধ্যে দ্ব্যক্ধিক অভিজ্ঞতার সম্পর্কটিকে একটি টেক্সট বয়নে লিপিবদ্ধ করেন। সাহিত্য সময়ের যুগ চিহ্নগুলিকে ধারণ করতে করতে অগ্রসর হয়। জীবনে চলার পথে সময় প্রতিনিয়ত প্রবাহমান। সময় এগিয়ে চলে প্রতিটি শিল্পমাধ্যমে। সময়ের মাত্রাকে ধারণ করতে করতে বদলে যেতে থাকে বিষয়বস্তু। প্রত্যেকটি সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে সময় এবং পরিবেশ পরিস্থিতি স্রষ্টার মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এর মধ্য থেকেই স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন। সমকালীন স্থান ও কালকে স্রষ্টা অস্বীকার করে অগ্রসর হতে পারেন না। স্থান ও কালের গণ্ডির মধ্যে তাঁকে বাধা পরতে হয়। বলা বাহুল্য বলিষ্ঠ ভাবে সাহিত্যের যে শাখাটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেশ-কালের কথাকে লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে সেই শাখাটি হল উপন্যাসের শাখা। উপন্যাসের বৃহৎ আখ্যানমালায় স্থান করে নিয়েছে সমকালীন বয়ে যাওয়া সময়ের ইতিকথা।

উনবিংশ শতকের বাংলা উপন্যাসের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না একজন ঔপন্যাসিক কখনও দেশ-কাল ব্যতিরেক অগ্রসর হতে পারেননি। দেশ-কালকে মাথায় রেখেই তাঁকে উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করতে হয়েছে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি বর্গ থেকে বিংশ শতকের শেষ দশকের সময়ের পরিসরকে যদি একটু ধরার চেষ্টা করি তাহলে ঔপন্যাসিকের দায় এবং দায়িত্বের প্রতি আমাদের বদান্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সমকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পটচিত্রের নানা সংরূপ আমরা খুঁজে পাবো। উপনিবেশিক শাসন-শোষণ, স্বদেশী আন্দোলন, সমকালীন প্রথা, সংস্কার, নারীদের অবস্থান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতার পিপাসা, স্বপ্নময় ভারতবাসীর আশা-আশাভঙ্গ, হতাশা, অবসাদ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশভাগ, বঙ্গ বিভাজন, ইত্যাদি সময়ের চালচিত্রকে আমরা অন্বেষণ করতে পারবো। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে বাঙালি জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়, উপনিবেশিকতাবাদের নতুন চরিত্র অর্জন, মধ্যবিত্ত পরিবারে অস্থিরতা, ভাঙ্গন, উদ্বাস্তু আগমন, একালবর্তী পরিবারের ভাঙ্গন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পটপরিবর্তন, পুঁজিবাদের আগ্রাসন, বেকার সমস্যা, বিশ্বায়ন, ফলস্বরূপ পরিবেশ থেকে জনস্বাস্থ্য, বিজ্ঞাপন, খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন প্রভৃতি সময়ের সমকালীন ভারতবর্ষের অলিন্দগুলিকে খুঁজে নিতে পেয়েছে।

উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের প্রথম সৃষ্ট উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ নামক আখ্যানে বিশ্বস্ত ভাবে চিত্রিত হয়েছে সমকালীন কলকাতার বাবু সমাজের অন্যতম প্রতিভূ বখাটে ছেলে ‘মতিলাল’ চরিত্রটি। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষ’, কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে সমকালীন উপাদান রূপে এসেছে বাংলার সমাজের অন্যতম সমস্যা বাল্যবিধবা, নারীদের বঞ্চনার কথা। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে পরাধীন ভারতবর্ষের নানান চালচিত্র, স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি। বঙ্কিম পরবর্তী বিংশ শতকের অন্যতম নক্ষত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চোখের বালি’, ‘ঘরে বাইরে’ প্রভৃতি উপন্যাসে উঠে এসেছে বিধবা এবং বাল্যবিধবাদের মর্মগাথা, স্বদেশী আন্দোলনের বাঁকবদলের প্রতিচ্ছবি। রমেশ চন্দ্র সেনের কখন বিশ্বেও সমকালীন দেশ-কালের মর্মগাথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর অন্যতম বহুচর্চিত উপন্যাস ‘চক্রবাক’ উপন্যাসে তৎকালীন যুগধর্ম ধরা পড়েছে। অন্যদিকে তাঁর ‘কুরপালা’, ‘শতাব্দী’ এই দুই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে গান্ধীবাদী আন্দোলনের নানা রূপচ্ছবি। ‘গৌরীগ্রাম’ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসের চিত্র। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘কালিন্দী’, ‘মন্মথর’, ‘গণদেবতা’, প্রভৃতি উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন স্বদেশী আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর মতো সময়ের চেতনা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অশনিসংকেত’ উপন্যাসে স্বকালের দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর করাল রূপ চিত্রিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’, ‘চিহ্ন’, ‘স্বাধীনতার স্বাদ’ প্রভৃতি উপন্যাসে উঠে এসেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মহামারী মতো বিষয়গুলি। শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’, ‘পল্লীসমাজ’, ‘শ্রীকান্ত’, প্রভৃতি উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলন, মহামারী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধভোর কালের মধ্যবিত্তের বিপন্নতার চিত্র পদধ্বনিত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যিনি সময়ের স্বরকে ঐকেছেন অপরূপ দক্ষতায়। তাঁর ‘বিদিশা’ উপন্যাসে দেশবিভাগের লেলিহান শিখাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের নিবিড় পাঠে উদীয়মান হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভীতি বিহীন দৃশ্য, দেশভাগ পরবর্তী সময়ে সমাজের বিপর্যস্ত রূপ, ছিন্নমূল মানুষের নিদারুণ অসহ্যতা ও দিনযাপনের মরিয়া সংগ্রামের ছবি।

চল্লিশের দশকের অন্যতম কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসেও ফুটে উঠেছে সমকালীন দেশ-কালের ভিন্ন চালচিত্র। বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা, ভারতজুড়ে মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশবিভাগের মর্মস্পর্শী ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। ‘দ্বীপপুঞ্জ’, ‘চেনামহল’, ‘নীড়ের কথা’, ‘নির্বাসন’ প্রভৃতি উপন্যাস তাঁর উজ্জ্বলতম উদাহরণ। ওই শতকেরই কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দীর কথনবিশ্বেও উঠে এসেছে সমকালীন সময়ের ছায়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগের মতো লোমহর্ষক চিত্র। ‘বারো ঘর এক উঠোন’, ‘সূর্যমুখী’ এ-রকম বহু উপন্যাসে তার স্বরূপ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এই ধারার পঞ্চাশের দশকের কথাশিল্পী রমাপদ চৌধুরীর আখ্যানবিশ্বেও উঠে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করুণ কঠিন দৃশ্য, দাঙ্গা, দেশভাগ পরবর্তী সময়ের মানুষের উদ্বাস্তু হওয়া, বাস্তবত্যাগী মানুষের আগমন, কলকাতার বুকো মন্বন্তরের বীভৎসতা, গণবিক্ষোভ, বামপন্থীদের উত্থান ইত্যাদি ঘটনাগুলি ‘খারিজ’, ‘অভিমুখ্য’, ‘বাড়ি বদলে যায়’ প্রভৃতি উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এছাড়া প্রবোধ সান্যাল, অসীম রায়, শক্তিপদ রাজগুরু, নারায়ণ সান্যাল, জ্যোতিময়ী দেবী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, গুণময় মাল্লা, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সেলিনা হোসেন, সমরেশ মজুমদারের কথাবিশ্বেও উঠে এসেছে ১৯৪৭ এর দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার ইতিবৃত্ত।

বিশ শতকের ছয় এবং সাতের দশক বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক বিরলতম সময়। যে সময়টায় অশান্ত হয়েছিল গোটা পশ্চিমবঙ্গ। ছয়ের দশকে দণ্ডকারণ্য সমস্যা, (১৯৫৭) আসামের দাঙ্গা, (১৯৬০) বেরগারী সমস্যা, (১৯৬০) খাদ্য আন্দোলন, (১৯৬৬) বামপন্থী রাজনীতির উত্থান-পতন, কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গন, (১৯৬৪) চীন ভারত যুদ্ধ, (১৯৬২) জাতীয় জরুরী অবস্থা, (১৯৬২, ১৯৬৮, ১৯৭১, ১৯৭২) নকশাল আন্দোলন, (১৯৬৭) ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, (১৯৬৫) কংগ্রেসী শাসনকাল, কংগ্রেসী শাসনের অবসান, (১৯৬৭), যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন (১৯৬৭ সালের ২রা মার্চ), (১৯৬৭ নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট) সরকারের ভাঙ্গন, পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন (১৯৬৮), (১৯৬৯) সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আবার যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা দখল, (১৯৭০) সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি, আমলাদের অপব্যবহার ইত্যাদি নানান ঘটনাকে সাক্ষী রেখে ছয়ের দশকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সাতের দশক মানেই সংঘর্ষ, হত্যাকাণ্ড, এবং খুনোখুনির সময়ের নিরবিচ্ছিন্ন ছবি। ১৯৭০-৭১ সময়পর্বে কংগ্রেস ও সিপিআই এম সংঘর্ষ, কংগ্রেস-নকশালপন্থী সংঘর্ষ, পুলিশ-নকশাল সংঘর্ষ, সিপি আই এম-নকশাল সংঘর্ষ, সিপি আই এমের সঙ্গে অন্যান্য বামপন্থী দলের সংঘর্ষ উভয় দিক ছিল গোটা পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৭২ আবার কংগ্রেস সরকারের ক্ষমতায় দখল। কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে নকশালপন্থীদের রক্তক্ষয়ী লড়াই, ১৯৭২ সাল মাঝামাঝি সময় থেকে নকশাল আন্দোলনের পতনের সূচনা। ১৯৭৭ সাল বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা দখল। ওই বছরেই জাতীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের পতন। ১৯৮০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর আবার সগৌরবে ফিরে আসা ইত্যাদি ঘটনাগুলি সাক্ষী রেখে সাতের দশকের চালচিত্র নির্মিত হয়েছে। এই সময়কালে দাঁড়িয়ে যারা তাদের কথনবিশ্বের ডালি সাজিয়ে সময়ের স্বরকে বন্দী করেছিলেন এই প্রসঙ্গে আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের ‘শ্রীচরণে মাকে’, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘ঘুণপোকা’, ‘শ্যাওলা’ ‘পারাবার’, চাণক্য সেনের ‘মুখ্যমন্ত্রী’, মতী নন্দীর ‘বারান্দা’, দিব্যেন্দু পালিতের ‘একা’, ‘সহযোদ্ধা’, বিমল করের ‘যদুবংশ’, সমরেশ বসুর ‘সংকট’ ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’, শৈবাল মিত্রের ‘অজ্ঞাত বাস’, বাণী বসুর ‘অন্তর্ঘাত’, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জার্নাল সন্তর’, তপোজয় ঘোষের ‘সামনে লড়াই’, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘একদা ঘাতক’, ‘হাওয়া গাড়ি’ সমরেশ মজুমদারের ‘কালবেলা’ প্রভৃতি উপন্যাসে ছয় এবং সাতের দশকের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমির নানান চিত্র আমরা উপস্থিত হতে দেখি।

সাতের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটানোর পর মানুষ ভেবে ছিল আটের দশকে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কিছুটা স্থিতি আসবে কিন্তু তা হয়নি। আগের দুই দশকের মতই এই দশকেও সামগ্রিকভাবে মূল্যবৃদ্ধি ছিল অব্যাহত। এই দশকেই আততায়ীর হাতে একজন প্রধানমন্ত্রীর নিধন এবং আর একজন প্রধানমন্ত্রীর নিষ্ঠুর মৃত্যু আমাদের দেশীয় রাজনীতিকে একটা সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এই সময় কেন্দ্র ও রাজ্যের সমস্যার কথাগুলি উঠে এসেছিল নানান দিক থেকে। বিশেষ করে অর্থ কমিশন ও পরিকল্পনা কমিশনের দেওয়া আর্থিক সাহায্যের স্বল্পতা নিয়ে সমগ্র আশির দশক ধরে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিরোধের নানান দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। ১৯৮০ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা

নিয়ে ফিরে আসে ইন্দিরা সরকার। ক্ষমতায় ফিরে এসে চালু করেন এসমা ও নাসা-র মতো আইন। কেন্দ্রে কংগ্রেস ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই নয়টি রাজ্যের অকংগ্রেস সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ১৯৮৪ সালে অপারেশান ব্লু-স্টার শুরু হয়। ১৯৮৪ সালের জুন মাসে পাঞ্জাবের স্বর্ণ মন্দিরে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান শুরু হয়। ভারতীয় সেনার সাহায্যে স্বর্ণ মন্দির খালিস্তানিদের কাছে থেকে দখল মুক্ত হয়। ১৯৮৪ সাল বিমান দুর্ঘটনায় সঞ্জয় গান্ধীর মৃত্যু, রাজীব গান্ধী ইন্দিরা গান্ধীর সহায়ক রূপে নিযুক্ত হওয়া। ১৯৮৫-৮৯ এই সময় পর্বে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি দেখা দিয়ে ছিল। ১৯৮৯ এর সাধারণ নির্বাচনে রাজীব গান্ধীর ভরাডুবি এবং কংগ্রেসী শাসনের অবসান, বিশ্বনাথপ্রতাপ নেতৃত্বাধীন জাতীয় মর্চা গঠন এবং তাদের মন্ত্রীসভা গঠন। ১৯৯০ সালে মর্চা সরকারের পতন ঘটে এবং চন্দ্রশেখর মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ১৯৯১ নির্বাচনের সময় রাজীব গান্ধীর মৃত্যু, পি ভি নরসিং রাও এর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ।

২১ জুন ১৯৭৭ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যনীতিতে পালাবদল ঘটে যায়। দীর্ঘ সময়ের কংগ্রেস সরকারকে গদিচ্যুত করে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ফিরে আসে। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হন, অর্থ ও পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী হন অশোক মিত্র, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী হন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পর কয়েকটি সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে যেমন ভূমিসংস্কার আইন, ভাগচাষীদের উচ্ছেদ আটকাতে অপারেশন বর্গার উল্লেখযোগ্য সংস্কারগুলি। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, পুলিশকে সংগঠন করার অধিকার প্রদান ইত্যাদি দিকগুলি এই আমলে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপির মতো বীভৎস ঘটনা ঘটে যায়। ১৯৮০ সালে সিপি আই সমর্থন করে বামফ্রন্টকে; এই সময় দুটি নতুন দল যোগ দেয় বামপন্থী মর্চায়: ডব্লিউএসপি ও ডিএসপি। ১৯৮২ সালের নির্বাচনে দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করে বামফ্রন্ট। এই সময় ঘৃণ্য তিনটি হত্যাকাণ্ড ঘটে ১৯৮২-র ৩০ই এপ্রিল বিজন সেতু, ১৯৮৩-র ৬-জুলাই মালদা জেলার মালোপাড়া, ১৯৮৩-র ২১ ডিসেম্বর-বাদকুল্লা-গোপালপুর। ১৯৮৬ এই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বিচ্ছিন্ন বাদী শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং-র নেপালি ভাষাগোষ্ঠীর জন্য পৃথক রাজ্যের দাবী তোলে সুভাষ ঘিসিং এর নেতৃত্বে গোখা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট। ১৯৯০ সালের ৩০ মে বাণতলা গণধর্ষণ কাণ্ড প্রভৃতি ঘটনা রাজ্যরাজনীতিতে ব্যাপক পালাবদল ঘটায়। রাজ্য রাজনীতিতে বামপন্থীদের মধ্যে অন্তর্দন্দ দেখা যায়। দলের মধ্যে গুন্ডা-মস্তানদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত নিচু তলার কর্মীরা দলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। শীর্ষস্তরের নেতৃত্বগণ তাদের কথা শোনার চেষ্টা না করে, জেলার স্তরের নেতাদের অঙ্গুলীহেলনে চালিত হতে লাগল। তবে এই সময় পর্বে দলের মধ্যে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ধীরে ধীরে দেখা দিতে শুরু করে। ফলস্বরূপ এই সময় থেকেই দলে একটা অস্থিরতাময় পরিবেশ তৈরি হতে শুরু করে।

আটের দশকের রাজনীতির উত্তাল সময় যেমন সাধারণ মানুষকে নাড়া দিয়েছিল ঠিক তেমনি নাড়া দিয়েছিল শিল্পী সাহিত্যিকদের। সাহিত্যিকরা সেই সময়ের গাথাকে তারা বন্দী করলেন তাদের সৃষ্টিতে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় উঠে এলো সেই সময়ের লিপিমাল। সাহিত্যের যে শাখাটি সমকালের দেশ-কালের পটভূমিকে ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সেই শাখাটি হল উপন্যাসের শাখাটি। এই শতকে রচিত বিভিন্ন উপন্যাসে এই সময়ের চালচিত্র নবরূপে ধরা দিল। ১৯৭৮ সালে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, জেলে থাকা বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদান এবং সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে। রাজনীতির এই চিত্র ধরা পড়েছে সমরেশ মজুমদারের ‘কালবেলা’ উপন্যাসে। লেখক ‘কালবেলা’ উপন্যাসে লিখেছেন—

“সরকার পাল্টে গেছে এর মধ্যে। ...পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিপুল ভোটে বামপন্থীদের নির্বাচিত করেছেন। ...হটাৎ জেলের মধ্যে উৎসবের মেজাজ এসে গেল। নতুন সরকার নাকি রাজনৈতিক ভাবে নকশাল বন্দীদের মোকাবেলা করবেন। বাইরে এখন বন্দীমুক্তি আন্দোলন চলছে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিছু কিছু নকশালপন্থীদের তারা মুক্তি দেবেন। ...আদালতে যে মামলা চলছিল তা সরকার পক্ষ তুলে নেবার সিদ্ধান্ত করলেন।”<sup>৩</sup>



যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভূমি সংস্কারের ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রতিশ্রুতি মতো অতিরিক্ত জমি, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন এবং বর্গাচাষি উচ্ছেদ বন্ধের চেষ্টা এই সময় লক্ষ্য করা যায়। জমির ওপর জমি মালিকদের একচেটিয়া অধিকারের অবসান, কৃষক সমিতির মাধ্যমে জমির সুখম বণ্টন ইত্যাদি নানা দিক উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ উপন্যাসেও উঠে এসেছে ভূমিসংস্কারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের প্রতিচ্ছবি। আখ্যানে লেখক দেখিয়েছেন ভূমিসংস্কার আইনে কিছু মানুষের সুবিধা হলেও, মুষ্টিমেয় ভাগচাষী, প্রান্তিক চাষিদের সুরাহা করা যায়নি। উন্নয়নের ঢাউস বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের ঘর আর গোয়ালটুকু ঢেকে রাখে চ্যারকেটু। ক্ষুধার নিবৃত্তি করে সে জল খেয়ে। উপোষী শরীরেও সে হয়ে ওঠে মিছিলের একজন। শহরে এসে একটা সময় পর নিজের কোনও প্রাসঙ্গিকতাই খুঁজে পায় না চ্যারকেটু; ক্ষুধায় কাতর পরিবার আবারও গ্রামে ফিরে আসে। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ উপন্যাসে আটের দশকের ঘটে যাওয়া উত্তরবঙ্গের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাগুলি রূপ পেয়েছে। উপন্যাসে স্থান করে নিয়েছে উত্তরখণ্ড নামক পৃথক রাজ্যের দাবী, তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ ও উদ্বোধন, তিস্তাকে কেন্দ্র করে জমি অধিগ্রহণ ও উচ্ছেদ ইত্যাদি রাজনীতির নানারূপ চালচিত্র নির্মিত হয়েছে। গোখাঁদের পৃথক রাজ্যের দাবী নিয়ে গোখাঁল্যান্ড আন্দোলনের কথাও উঠে এসেছে আখ্যানের পরিসরে। বাসুদেব দাসগুপ্তের ‘খেলাধুলা; উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন বামপন্থী দলগুলির মধ্যে আদর্শহীনতার নানান প্রতিচ্ছবি। শুরুর চার বছরের বজ্র আঁটুনি কমিউনিস্ট পার্টিতে বেনোজলের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, ত্রুটি এই সময়কালে পরিলক্ষিত হতে থাকে। ১৯৮২-৮৩ সালে সুবর্ণরেখার শাখানদী খড়কাইয়ের উপর বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। বাঁধ নির্মাণের জন্য আদিবাসীদের জমি ব্যাপকভাবে অধিগ্রহীত হয় মূলত আদিভূমির ময়ূরভঞ্জ ও শিমলিপাল অঞ্চলে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাশ্বেতা দেবী লিখলেন ‘সুরজ গাগরাই’ উপন্যাস। অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘চাঁদ মনসার জোট’ উপন্যাসে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর, ১৯৭৮-র পর থেকে বামফ্রন্ট সরকারের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন শুরু হয়। অপারেশান বর্গা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মতো সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা শুরু হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গে। এই সময় গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। গ্রামের মানুষ চাষযোগ্য জমি যেমন অধিকার পেতে শুরু করে তেমনি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নানান ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে শুরু করেছিল। সমরেশ বসুর ‘তিনপুরুষ’ উপন্যাসে উঠে এসেছে ১৯৮২ সালে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর কমিউনিস্টদের ভোগবাদী মানসিকতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতি দিকগুলি। কমিউনিস্ট নেতারা ক্ষমতার জোরে নিজের লোকদের চাকরী দেয়। যেমন কংগ্রেস সরকারে থাকাকালীন অবৈধ ভাবে রাজ্য বিদ্যুৎ পরষদে হাজার হাজার লোককে চাকরী দিয়েছিল। তেমনি কমিউনিস্টরা চাকরীর লোভ দেখিয়ে পার্টি ক্যাডারদের ভোটের রাজনীতিতে নামাই, সেই কথা উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। জয়দেব বসুর ‘উত্তর যুগ’ উপন্যাসে উঠে এসেছে ১৯৮০-৮২ সালের ভারতবর্ষের সমকালীন হাল হকিকত। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ঘৃষ কাণ্ডের সঙ্গে নাম জড়িয়ে যাওয়া, জনগণের থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে, পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল প্রভৃতি দিকের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। সমকালীন বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা ভাবছে। এই সময়কালেই দেখা যায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইংরেজি তুলে দিয়ে সম্পূর্ণ মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। ভগীরথ মিশ্রের ‘নীলশ্রোত’ উপন্যাসেও উঠে এসেছে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ইতিকথা। ‘ফাঁসকল’ উপন্যাসে উঠে এসেছে রাজ্য-রাজনীতির নানান প্রসঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কংগ্রেসকে সরিয়ে বামপন্থীদের ক্ষমতা দখল, বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকাল নানা চিত্র, ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের অধীনে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ফলে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ইত্যাদি প্রসঙ্গ আখ্যানে উঠে এসেছে। আফসার আমেদ এর ‘ধানজ্যোৎস্না’ উপন্যাসেও উঠে এসেছে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সু-ফলের কথা। মুসলমান সমাজ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। সখিনার প্রথম স্বামী কাঠমিস্ত্রি নূর আলি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ফলে সহজেই ঋণের সুবিধাও পেয়েছে। অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্যর ‘সময়ের অপেক্ষায়’ উপন্যাসেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে। সাধন চট্টোপাধ্যায় এর ‘তেঁতুল পাতার ঝোল’ উপন্যাসে সমকালীন বঙ্গীয় শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব ছবি ধরা পড়েছে। এই সময়কালে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে কুৎসিত খেলায় মেতে উঠেছিল। স্কুল, কলেজে শিক্ষক মহাশয়কে ল্যাম্পোস্ট হিসেবে রেখে ম্যানেজিং কমিটি নিজের দলের লোককে বসিয়ে শিক্ষাঙ্গনে দলতন্ত্র কায়েম করে শিক্ষাব্যবস্থা পঙ্গু করার চেষ্টা হয়েছে। সরকারী স্কুলে

ইংরেজি মাধ্যম তুলে দিয়ে, অন্যদিকে বেসরকারী মাধ্যম স্কুল প্রতিষ্ঠার সমর্থন প্রদান করে। প্রসঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছে শিক্ষকদের বয়স অবসর ৬২ থেকে ৬০ করা। ফলস্বরূপ শিক্ষকদের আন্দোলন ইত্যাদি নানান প্রসঙ্গ সমকালীন প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে। ‘পক্ষ ও বিপক্ষ’ উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে ১৯৭৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের স্বৈরাচারী ও অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে পথ চলা শুরু করেছে বামফ্রন্ট সরকার। ক্ষমতা পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিভাজনের চিত্র অর্থাৎ শ্রেণী সম্পর্কে নতুন ধ্যান ধারণা তৈরি হয়েছে। উপন্যাসে এসেছে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসায় তাদের প্রতিশ্রুতি মতো চালু করেছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার আইন বলবৎ করেছে নতুন উদ্যমে। ভূমিহীন কৃষকরা জমির অধিকার লাভ করেছে। চালু হয়েছে বর্গাদার ব্যবস্থা। সাধন চট্টোপাধ্যায় শুরুতেই জানিয়েছেন- জমিদারী ব্যবস্থার বদল ঘটেছে, শুরু হয়েছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, জনসাধারণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বেড়েছে। পঞ্চায়েত, সংসদ ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসন এবং মহিলা আসন ধারণা চালু হয়েছে। উপন্যাসে উঠে এসেছে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে গ্রামীণ রাজনীতির প্রেক্ষাপট। গড়ে উঠছে শহুরে সংস্কৃতি ও পরিবেশের আদলে নতুন আধুনিক গ্রাম্য পলিটিক্স। আধুনিকতার উত্তরণ ঘটেছে জলসেচ ব্যবস্থায়, হাইব্রিড বীজের উচ্চফলনশীল চাষাবাস বেড়েছে, গড়ে উঠছে রিভার লিফট পাম্প ব্যবস্থা। তখন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বুড়োশিবতলার কথকথা’ উপন্যাসে উঠে এসেছে ১৯৯০ সালের বানতলা হত্যা কাণ্ড। আখ্যানে তার বর্ণনা করেছেন লেখক—

“কলকাতা থেকে কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার দূরে বুড়ো শিবতলা বাজারের কাছে কাল সন্ধ্যায় একদল লোক একটি সাদা মারুতি ভ্যানকে বাসস্তীর দিক থেকে আসতে দেখে ‘ছেলেধরা’ ‘ছেলেধরা’ বলে তাড়া করে। ...আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা হল, মারুতির ড্রাইভার ও ভিতরের তিন মহিলাকে উন্মত্ত জনতা টেনে-হেঁচড়ে বার করে ও প্রচণ্ড প্রহারে ক্ষতবিক্ষত করে। ঘটনাস্থলেই মারুতির ড্রাইভার ও একজন মহিলা মারা যায়, অন্য দুই মহিলাকে গুরুতর আহত অবস্থায় মধ্যরাতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।”<sup>৪</sup>

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের ‘মেঘের পরে রোদ’ উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে গোখাঁদের পৃথক রাজ্য গোখাঁল্যান্ড প্রসঙ্গ। উপন্যাসে দেখা যায় গোখাঁল্যান্ডের দাবীতে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে মানুষকে আহ্বান করা হচ্ছে। আন্দোলনে সাড়া না দিলে বল প্রয়োগের মতো ব্যবস্থা তারা সংগঠিত করেছে। পৃথক গোখাঁ রাজ্যের নেতা সামসি গ্রেগরি, যখন তার বাবা ভিভিয়ানকে মিটিং-এ যেতে বলে, তখন ভিভিয়ান জানায় তার বাবা অর্থাৎ গ্রেগরির ঠাকুরদা খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিল। তার নাম বদলে হয়েছিল ড্যানিয়েল লেপচা। ফলে এই আন্দোলনের সঙ্গে নারীর টান সে অনুভব করে না। লেখক পিতা ও পুত্রের এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গোখাঁল্যান্ডের পক্ষ ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি তুলে এনেছেন। সৈকত রক্ষিত এর ‘আকরিক’ উপন্যাসে উঠে এসেছে সমকালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। বামফ্রন্ট ১৯৭৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতা দখল করে। এই সময় সরকার এক গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং বর্গাদার আইন প্রণয়ন করা। উপন্যাসিক উপন্যাসে দেখিয়েছেন নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ফলে গ্রামগুলির শ্রীবৃদ্ধি তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সরকারী প্রকল্প গ্রামগুলিতে বিভিন্ন ভাবে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছিল। পাশাপাশি দেখিয়েছেন বর্গাদার ব্যবস্থা ও নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ফ্রণটি বিচ্যুতিগুলি। ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষকদের জমির স্বত্ব দেওয়ায় কিছু বন্টন পদ্ধতিতে ফ্রণটি পরিলক্ষিত হয়। ফলস্বরূপ অনেকক্ষেত্রেই বঞ্চিতরা ভাগচাষের অধিকার হারালো। ভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে লাগলো। উপন্যাসে দেখা যায় রাম ভজন সাউ এর জমি ভাগচাষি আদিম আনসারীকে জমি থেকে বঞ্চিত করার সর্বত্র প্রচেষ্টা রামভজন করতে বাকি রাখেনি। বিভিন্ন অনিয়ম চলতে লাগল-বন্ধকী জমি কোবালার সুযোগে নিজ নামে লিখিয়ে নেওয়া, হাল রসিদ না থাকলে দখলি জমিও জমিদারের খতিয়ানে যুক্ত হওয়া, জমি বদল করে প্রথমে বেনামী করে জমি আত্মসাৎ, সেটেলমেন্টে প্রজার জমি কম করে দেখানো। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় দুর্নীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

নয়ের দশক থেকে জাতীয় রাজনীতিতে ক্রমশ কংগ্রেসীদের অস্তিত্ব প্রস্ফটিকের মধ্যে দাঁড় করিয়েছিল। এই সময় কংগ্রেসীদের দাপট ক্রমাগত হ্রাস পেতে শুরু করে। জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপির ক্রমশ উত্থান হতে শুরু করে। এই দশকে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে হাতিয়ার করে সংঘ পরিবার জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ১৯৮৪ সালের

লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছিল দুটি আসন; ১৯৮৯ তারা পায় ৮৯টি আসন। ১৯৮৯ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে তাতে সমর্থন জানায় বিজেপি। ১৯৯০ সালে মণ্ডল কমিশনের প্রশ্নে নির্দিষ্ট অবস্থান না নিয়ে, ধর্মের মাধ্যমে মেরুকরণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার অলিন্দে আসতে চেয়েছিল। ১৯৯০ সালের ২৫-এ সেপ্টেম্বর বিজেপি ঘোষণা করে, গুজরাটের সোমনাথ মন্দির থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রথযাত্রা হবে। গুজরাট থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রা দিল্লিতে অবস্থান কালে কেন্দ্রীয় সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি, বিজেপি তাদের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে পারে এই আশঙ্কায়। শোভাযাত্রা গিয়ে পৌঁছায় বিহার হয়ে উত্তর প্রদেশে তৎকালীন বিহার এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব এবং মুলায়ম সিং যাদব পার্টি কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হলেও অনেকটাই দেরি হয়ে যায়। তারপরেও বহু করসেবক পৌঁছে যায় সেই বহুবিতর্কিত অযোধ্যার জমির কাছে। আক্রমণ নেমে আসে বাবরি মসজিদের ওপর। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে কেন্দ্র করে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। লক্ষ্য একটাই মারের পাল্টা মার। খুনের বদলা খুন। একই সঙ্গে বিজেপির জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে অটলবিহারী নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে কয়েকটি আঞ্চলিক দলের সমর্থন নিয়ে আবার বিজেপি সরকার গঠিত হয়। এবং ২০০৪ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

এই দশকে সমগ্র ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির আধিপত্য কয়েক হতে শুরু করে। কাশ্মীরের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতেও। ত্রিপুরায় বাঙালি বসতি আক্রান্ত হয়। মণিপুরে নাগা ও কুকিদের বিবাদ চরমে পৌঁছে যায়। নিজেদের নট ইন্ডিয়ান বলে যে সাম্প্রদায়িক উল্লেখ রাখে নাগা জনজাতি, তা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম (আলফা) ত্রিপুরা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স আর কুকি ন্যাশনাল আর্মির মধ্যে। স্বাধীন সার্বভৌম নাগাল্যান্ডের ধারণা নিয়ে উঠে আসে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড। এই দশকেই গ্রামীণ সংস্কৃতির ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয় এবং নানান গুণগত পরিবর্তন জন-জীবনকে দ্রুত উত্তর আধুনিক ভাবনার দিকে ঠেলে দেয়। এই দশকে পশ্চিমবঙ্গে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি। বামপন্থীরাই এই দশকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন দল হিসেবে নিজেদের আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। তবে এই সময় পূর্বে দলের মধ্যে চরম দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, মন্তানরাজ চরম আকার ধারণ করতে শুরু করে। পার্টিতে ক্রমশ বেনোজল ঢুকতে শুরু করে, শুরু হয় দলের ভিতর দলাদলি, পার্টি ধীরে ধীরে ফোঁফড়া হতে শুরু করে। এই সময় থেকেই লোকাল কমিটি ধরে ক্ষমতার মগডালে চড়ে বসার কারসাজি সূচিত হয়। ১৯৯৫ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস থেকে বেড়িয়ে সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেস স্থাপন করেন। বামপন্থীদের সঙ্গে শুরু হয় মমতার রাজনৈতিক লড়াই।

নয়ের দশকের রাজনীতির উত্তাল সময় যেমন সাধারণ মানুষকে নাড়া দিয়েছিল ঠিক তেমনি নাড়া দিয়েছিল শিল্পী সাহিত্যিকদের। সাহিত্যিকরা সেই সময়ের গাথাকে তারা বন্দী করলেন তাদের সৃষ্টিতে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় উঠে এলো সেই সময়ের লিপিমাল। সাহিত্যের যে শাখাটি সমকালের দেশ-কালের পটভূমিকে ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সেই শাখাটি হল উপন্যাসের শাখাটি। এই শতকে রচিত বিভিন্ন উপন্যাসে এই সময়ের চালচিত্র নবরূপে ধরা দিল। প্রফুল্ল রায়ের ‘রথযাত্রা’ নামক উপন্যাসে রথযাত্রা কে কেন্দ্র করে যে, ধর্ম ভিত্তিক মেরুকরণের রাজনীতি জাতীয় প্রেক্ষাপটে শুরু হয়েছিল তার ইঙ্গিত এই আখ্যানে উঠে এসেছে। ১৯৯০ সালে লালকৃষ্ণ আদবানীর হাত ধরে যে রথযাত্রা শুরু হয়েছিল তা পরোক্ষ ভাবে ফুটে উঠেছে। ভগীরথ মিশ্রের ‘মৃগয়া’ উপন্যাসে এসেছে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার প্রসঙ্গ। সারাদেশে দাঙ্গা লেগে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩২। আখ্যানের পরিসরে লেখক দেখিয়েছেন—

“বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে দেবার পর যখন দাঙ্গা লেগে গেল এখানে-ওখানে, চন্দন একটা গান বেঁধেছিল।

মৌলবাদকে চাবুক মেরে ছিল সেই গানে। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির কথাও ছিল।”<sup>৫</sup>

দেবেশ রায়ের ‘দাঙ্গার প্রতিবেদন’ উপন্যাসে এনেছেন বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার অনুপঞ্জ। উঠে এসেছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত প্রশাসনের নির্লজ্জ ভূমিকা, মৌলবাদের বীভৎসতা। অভিজিৎ সেন এর ‘আঁধারমহিষ’ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে দেশ জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়েছে সেই আলেখ্য রচিত হয়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসে লেখক সাম্প্রদায়িকতার বিপদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

জয়দেব বসুর ‘লুপ্ত ন্যাসপাতি’ উপন্যাসে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরের বছরের রাজনৈতিক অবস্থান প্রাধান্য পেয়েছে। লেখক উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন—

“...এই কাহিনী লেখা চলছে উনিশশো তিরানব্বই সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে। এই অনুচ্ছেদটি যখন লেখা হচ্ছে, ঠিক তার আগের দিন বর্তমান কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী নরসিং রাও, অজিত সিংহ গোষ্ঠীর সাতজন সাংসদ ভাঙিয়ে কোনোক্রমে গদি রক্ষা করেছেন। ...তৃষণ্ত ড্রাকুলার মতো নখ শানাচ্ছেন কাউন্ট লালকৃষ্ণ আডবানী, ফুয়েরার মুরলী মনোহর যোশি এবং আরএসএস পরিচালিত ভারতীয় জনতা পার্টি’। ...”<sup>৬</sup>

সমরেশ বসুর ‘ঠিকানা ভারতবর্ষ’ উপন্যাসে সমকালীন ভারতবর্ষের ত্রিপুরা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির আগ্রাসন স্থান পেয়েছে। কামতাপুর আন্দোলনকে পটভূমি করে লেখা তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘খণ্ড বিখন্ড’। এই উপন্যাসে লেখক জাতিসত্তার বিদ্রোহ, বিভেদকে দেখিয়েছেন দক্ষতার সঙ্গে। উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক বয়ান -

“কামতাপুরিদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি ...আমরা কিছুতেই পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবী মেনে নেব না। ...কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি ছোট রাজ্য গড়তে চাওয়ায় আরও উৎসাহিত হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী কামতাপুরিরা। ...যারা জাতপাতের নামে, ভাষার নামে, সাম্প্রদায়িকতার নামে রাজবংশীদের মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে তাদের জায়গা উত্তরবঙ্গের মাটিতে হবে না।”<sup>৭</sup>

নবারুণ ভট্টাচার্য এর ‘হারবার্ট’ উপন্যাসে সত্তরের উত্তাল সময় এবং নব্বইয়ের পরবর্তী সময়ের কথা উঠে এসেছে। বিনয়দের লুকিয়ে রাখা ডিনামাইট স্টিক আগুনের সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরণ ঘটায়, ধসিয়ে দেয় ক্রিমোটোরিয়াম; আর নবারুণ লেখেন -

“...কখন কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনো বাকি আছে’। ইলেকট্রিক চুল্লি ধস্ত হলে পুলিশ তদন্তে নামে। উঠে আসে একের-পর এক তত্ত্ব—  
...১৯৯১ এর ২১ মে যে ঘটনা ঘটেছিল তার থেকে এমনভাবে যথেষ্ট ভাবার কারণ আছে যে এল টি টি ই -র লাইভ হিউম্যান বন্ধ ধানুর সঙ্গে তুলনীয় হারবার্ট ছিল একটি ডেড হিউম্যান বন্ধ। ...”<sup>৮</sup>

অভিজিৎ সেনের ‘ছায়ার পাখি’ উপন্যাসে নয়ের দশকের বামপন্থীদের ভোগবাদী মানসিকতা, স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তি, আদর্শহীনতা প্রভৃতি উঠে এসেছে। পুরনো পার্টি কর্মীদের গুরুত্ব না দেওয়া, দলে আপাতমস্তক দুর্নীতিগ্রস্তদের জায়গা করে দেওয়া, সর্বহারার সরকার পরিণত হয় ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের রূপকথায়। লেখক দেখিয়েছেন - গোপাল মজুমদার আদ্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান পার্টিকর্মী, অথচ স্বার্থান্বেষীরা তাঁকে ক্রমে নির্বাসনে পাঠায়; ফলত সে বেছে নেয় একার নির্বাসন। ‘টাড়াবাংলার’য় তপন বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে এসেছেন ভূমি-সংস্কার এবং বদলের ধারাভাষ্য। ভূমি-সংস্কারের ফলে সমাজকাঠামো বদলে যায়, সামন্ততন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব সরে গিয়ে পরোক্ষ এসেছে পার্টিতন্ত্রের বেশ। সেখানে জমিদারের শূন্য আসন পূর্ণ করেছে পার্টি। বেনামী জমি নিয়ে পার্টির খবরদারী, বর্গা সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে। সমরেশ মজুমদারের ‘চতুষ্ক’ উপন্যাসে প্রসঙ্গ হিসেবে এসেছে আট ও নয়ের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নানান দিক। কংগ্রেসের সরকারের নৈরাজ্যের অবসান, বামপন্থী দলগুলির ক্ষমতা দখল, বামপন্থী দলের অবক্ষয়, তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান ইত্যাদি বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসে। ‘মৌষলকাল’ উপন্যাসটির সময়কাল ১৯৯৯-২০০০ এই সময়কালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের ঘুণধরা অবস্থা উঠে এসেছে। ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে সপ্তম বারের জন্য সরকার গঠন করে বামফ্রন্ট সরকার। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো শিল্পায়নের পথে এগোতে গেলে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় সরকারকে আখ্যানে সেই সময়পর্বের ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। অন্যদিকে শেষের দিকের বামফ্রন্ট সরকারের অবক্ষয়িত রূপও আলোকিত হয়েছে। এই সময়কালে পার্টির নেতারা পাড়ার মস্তানদের হাতে রেখে ভোটব্যাক ঠিক রাখার আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সর্বত্র বিরোধী শূন্য করার একটা প্রবণতা এই সময় বামফ্রন্ট



নেতাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে দলের নেতা, মন্ত্রী, ক্যাডারদের চরম ঔদ্ধত্য, দলীয় মতাদর্শকে বলি দিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর ঘৃণ্য প্রচেষ্টা দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসিকের কথায় তা স্পষ্ট—

“বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার কয়েক বছর পর থেকে ধীরে ধীরে পার্টির নব্য নেতারা সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁরা যা বলবেন সেটাই ছিল শেষ কথা তার জন্য জেলা কমিটির অনুমোদনের দরকার নেই। বামবিরোধী দলগুলো মাঝে মাঝে গলা খুললেও বেশির ভাগ সময় তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না।”<sup>৯</sup>

উপন্যাসে দেখা যায় ঈশ্বর পুকুর লেন বস্তিতে বামফ্রন্টের স্থানীয় নেতা সুরেন মাইতিই শেষ কথা। পাড়ার সমস্ত কাজকর্ম তার নির্দেশে হয়। অনিমেঘ দেখেছিল কমিউনিস্ট পার্টির একজন নীচু তলার কর্মী হয়ে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছেন। খুন, জখম, রাহাজানি, জুলুমবাজি, বোমাবাজি এক ভয়াবহ বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছিল সমগ্র বস্তিতে। অনিমেঘের বর্ণনায় তা স্পষ্ট —

“মফস্বলে, গ্রামে, গঞ্জে ক্যাডার বাহিনীর এক একজন চেঙ্গিস খাঁ হয়ে উঠল। বিস্ময় লাগে, তার পরের নির্বাচনগুলিতেও বামফ্রন্ট জিতে চলেছে, একটা বড়ো অংশের ভোটার তাদের ভোট দেয়নি কিন্তু নির্বাচনে জেতার কায়দাগুলো আয়ত্তে থাকায় ফ্রন্টের জিততে অসুবিধা হয়নি।”<sup>১০</sup>

‘গর্ভধারিণী’ উপন্যাসে বামফ্রন্ট সরকারের আমলের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটি ও বেকার সমস্যার চিত্র ধরা পড়েছে। তখন কলেজগুলিতে ভর্তির ফি ছিল সাধারণ ছাত্রের সাধের বাইরে, বি.এ পাশ করে চাকরীর সম্ভাবনাও ছিল ক্ষীণ। উপন্যাসের আনন্দ চরিত্রের সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার সেই চিত্র ধরা পড়েছে—

“যে জন্য গরু পোষে মানুষ, যত্ন করে শিশুকাল থেকে খোল বিচুলি খাওয়ায়, তেমনি করে আমরা তৈরি হই একটা ডিগ্রি পাওয়ার জন্য।”<sup>১১</sup>

আবার উপন্যাসের অপর এক চরিত্র কল্যাণের মধ্য তৎকালীন বেকার সমস্যার পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটির দিকগুলি উঠে এসেছে—

“...। এই শিক্ষার কোন মানে হয় না? একটা সুপারিকল্পিত চালাকির মধ্যে তাদের প্রতি বছর ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আর তারা সেই খাতে ঘোলা জল হয়ে বয়ে যাচ্ছে।”<sup>১২</sup>

বলা বাহুল্য বিশ শতকের আট ও নয় দশক জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষণগৃহে দাঁড়িয়ে চলমান সময়ে ঘটে যাওয়া ইতিবৃত্তগুলি দক্ষতার সঙ্গে রূপ পেয়েছে। উপন্যাসের বিভিন্ন পরিসরে স্থান ও কালিক নির্ণয়ে এক একটি ঘটনা অনবদ্য ভাবে এসেছে। ৭৭-পরবর্তী ভূমিসংস্কার, অপারেশন বর্গা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলি আমরা উপন্যাসে পেলাম। সমাজ বিপ্লবের গুরুত্ব এই সময় থেকেই, ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করে; নির্বাচন হয়ে ওঠে ক্ষমতা দখলের পন্থা মাত্র। নয় দশক ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্ম ক্রমেই আলোচ্য এবং গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে, ৯২-এর ৬ ডিসেম্বরের আঁচ যে এই রাজ্যেও পড়েছিল তা এই সময়ের বাংলা উপন্যাসে ধরা পড়ল। নয়া-উদারনৈতিক অর্থনীতি আমাদের দেশে কোন ভূমিকায় এসেছে, কিংবা এ-দেশে তার কোন বিশেষ ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক দিক, বাংলা উপন্যাসে ফুটে উঠল।

## Reference:

১. মজুমদার, মোহিতলাল, ‘সাহিত্য ও যুগধর্ম’, সাহিত্য বিতান, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৩৬৮, পৃ. ৩২৩
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, ‘উপন্যাসের কালান্তর’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৭
৩. মজুমদার, সমরেশ, ‘কালবেলা’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩১০-৩১১
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, ‘বুড়ো শিবতলার কথকতা’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪৪-৪৫
৫. মিশ্র, ভগীরথ, ‘মুগয়া’, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১০২১-১০২২
৬. বসু, জয়দেব, ‘লুপ্ত ন্যাসপাতি’, ‘ধানসিঁড়ি প্রকাশন’, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪৫

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'খণ্ড বিখন্ড', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, মাঘ ১৪১৬, পৃ. ১০৯-১১০
৮. ভট্টাচার্য, নবারণ, 'হারবার্ট', দেজ পাবলিশিং, ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৭৮
৯. মজুমদার, সমরেশ, 'মৌষলকাল', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ৮০-৮১
১০. মজুমদার, সমরেশ, 'গর্ভধারিণী', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১০১-১১১
১১. মিশ্র, ভগীরথ, 'অন্তর্গত নীলস্রোত', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫
১২. রায়, প্রফুল্ল, 'রামচরিত্র', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

#### Bibliography:

- দেবী, মহাশ্বেতা, 'সুরজ গাগরাই', মহাশ্বেতা রচনাবলী, (একাদশ খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৯
- দাশগুপ্ত, বাসুদেব, 'খেলাধুলা', অশোক নগর: আনন্দ দাশগুপ্ত (পরিবেশক: মনফকিরা), জানুয়ারি, ২০০৭
- বসু, সমরেশ, 'তিনপুরুষ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬
- রায়, দেবেশ, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩
- রায়, দেবেশ, 'মফস্বলি বৃত্তান্ত', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১২
- চক্রবর্তী, অমলেন্দু, 'চাঁদ মনসার জোট', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১০
- বসু, জয়দেব, 'উত্তর যুগ', ধানসিঁড়ি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬
- মজুমদার, সমরেশ, 'ঠিকানা ভারতবর্ষ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৩
- মিশ্র, ভগীরথ, 'ফাঁসবদল', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬
- মজুমদার, সমরেশ, 'মৌষলকাল', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪
- মজুমদার, সমরেশ, 'গর্ভধারিণী', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫
- সেন, অভিজিৎ, 'আঁধার মহিষ', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩
- বসু, জ্যোতি, 'যত দূর মনে পড়ে', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, আগস্ট, ২০০৬
- গুহ, রামচন্দ্র, 'দাঙ্গা', গাঁধী- উত্তর ভারতবর্ষ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নভেম্বর, ২০১২
- মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার, 'দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা কথাসাহিত্য', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৫
- রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, 'দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮
- দাস, অরুণকুমার, 'ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২
- খাঁ, শান্তিময়, ও লিলু মণ্ডল, 'স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য', কলিকাতা লেটারপ্রেস, কলকাতা, ২০১৯
- রায়, সিদ্ধার্থ গুহ, 'স্বাধীনতা উত্তর ভারত: ১৯৪৭-২০২২', সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, আগস্ট, ২০২৪